বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২৯ বছরে খুন হয়েছে ১০৯ জন ॥ আহত দশ হাজারের বেশি

অখিল পোদ্দার, ইবি থেকে ॥ স্বাধীনতার পর গত ২৯ বছরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংঘর্ষ ও সহিংস ঘটনায় নিহত হয়েছে ১০৯ জন, আহত হয়েছে দশ হাজারের অধিক। এর মধ্যে মারাত্মক জখম হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ২শ'। এ সকল হত্যাহতের পিছনে রয়েছে আধিপত্য বিস্তার, টেন্ডার, চাঁদাবাজি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এ পর্যন্ত ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ জন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক ৬১ জন খুন হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সংঘর্ষে নিহত ১০৯ জনের মধ্যে ৮২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিহতদের মধ্যে ছাত্রলীগের ৭৫ জন, ছাত্র শিবিরের ১৯ জন, ছাত্রদলের ১৮ জন, জাসদ ছাত্রলীগের ৮ জন, ছাত্র ইউনিয়নের ৪ জন, ছাত্রমৈত্রীর ৩ জন ও ছাত্রলীগ মন্টু গ্রুপের ২ জন রয়েছে।

'৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত যুবলীগ কর্মী মজনু গুলিতে নিহত হয়। একই বছরে প্রতিপক্ষের হাতে মারাত্মক জখম হয়ে প্রাণ হারায় ছাত্রলীগ নেতা তানভীর। দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে '৭৪ সালের ৪ এপ্রিল ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে মহসীন হলের "সেভেন মার্ডার" ছাত্র হত্যার এক কলঙ্কিত অধ্যায়। শফিউল আলম প্রধান ও তার বাহিনীর হাতে একে একে খুন হয় সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রনেতা নাজমুল হক কোহিনূরসহ রেজাউল রব সোহেল, ইদ্রিস, মোহাম্মদ হোসেন, জিন্নাহ, মাসুদ মাহমুদ স্বপন ও ইবাদ খান। বিচারে শফিউল আলম প্রধানসহ কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও দুই বছরের মাথায় তাঁরা ছাড়া পেয়ে যায়। '৭৭ সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে লুকু, ইনু, গোগা ও রিন্টু খুন হয়। একই কারণে '৭৮ সালে ছাত্রলীগের অপর ২ নেতা খুন হয়। ১৯৭৩ সালে কর্মচারী-শিক্ষক সংঘর্ষে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রঞ্জিত নামের এক ছাত্র নিহত হয়। পরে ১৯৮০ সালে প্রতিপক্ষের হাতে ছাত্রদল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক বীরপ্রতীক এটিএম খালিদ নিহত হয়। খালিদ হত্যার জের ধরে পর দিন ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও জাসদ ছাত্রলীগ ঐক্য করে ছাত্রলীগের হল ঘেরাও করে এলোপাতাড়ি গুলি চালালে বাকুবি ছাত্রলীগের শীর্ষ তিন নেতা শওকত, ওয়ালী ও মহসীন নিহত হয়। একই বছরের ৩ নবেম্বর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যকার সংঘর্ষে ছাত্রলীগ কর্মী মীর মোস্তফা এলাহী প্রাণ হারায়। ঐ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয় ১ জন, '৮২ সালে ১১ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যকার সংঘর্ষে সাব্বির, হামিদ, আইয়ুব ও জব্বার নিহত হয়। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয় ২ জন। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে '৮৩ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি এরশাদবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে জয়নুল, '৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ নেতা রওফুল বসুনিয়া, '৮৬ সালের ৩১ মার্চ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আসলাম, '৮৭ সালের ৯ মার্চ ছাত্রদল নেতা মাহবুবুল হক, মাইনুদ্দিন ও নূর মোহাম্মদ নিহত হয়। '৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর ছাত্রদল নেতা পাগলা শহীদ, '৯০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ নেতা চুন্নু হত্যা, ২৬ নবেম্বর নিমাই চন্দ্র, ২৭ নবেম্বর ডাঃ মিলন হত্যা ইতিহাস হয়ে আছে। ১৯৯২ সালে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল ও ছাত্র ইউনিয়নের মঈন হোসেন রাজু হত্যাকাণ্ড এখনও টক অব দ্য ক্যাম্পাস। '৯৩ সালে ছাত্রলীগ মন্টু গ্রুপের অলক, '৯৫ সালের ২১ জানুয়ারি জয়দীপ দত্ত চৌধুরী, '৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল পার্থপ্রতীম আচার্য খুন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা শাহজাহান সিরাজ, ছাত্রলীগ নেতা ইয়াসির আরাফাত, ছাত্রদলের বিশ্বজিৎ, ছাত্র ইউনিয়নের তপন, ছাত্রমৈত্রী নেতা দেবাশীষ ভট্টাচার্য রূপম, জাসাস নেতা আমানউল্লাহ আমান ও '৯৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রমৈত্রী নেতা জুবায়ের চৌধুরী রিমু হত্যাকাণ্ড ইতিহাস হয়ে আছে। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ বছরের ব্যবধানে খুন হয়েছে ৬ জন, আহত হয়েছে ৯শ' ৪৭ জন এবং নির্ধারিত বন্ধ ছিল ৪শ' ৭৯ দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনায় ক্ষতি হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ জনের পাশাপাশি আহত হয়েছে পাঁচ হাজারের অধিক আর্থিক, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পৌনে ২৫ কোটি টাকা। সন্ত্রাসের কারণে শুধু মতিহার থানায় মামলা হয়েছে অনেক পাশাপাশি ৩৩টি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত বন্ধ হয়েছে ৫৪ বার। এক সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা গেছে, ১৯৯৪ সালে সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ১শ' ৭৭টি সংঘর্ষ হয়েছে। এ সব সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ২১ জন এবং আহত হয়েছে ১২১৮ জন। সে দিক থেকে '৯৪ সালে প্রতি দুই দিনে একটি সংঘর্ষ এবং প্রতি ১৭ দিনে একজন নিহত হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডের পিছনে ব্যক্তিগত বিরোধ, টেন্ডারবাজি, ব্যবসায়িক স্বার্থ ও কর্তৃত্বের লড়াই রয়েছে।

এসব হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ছিল ব্যক্তিস্বার্থ টেন্ডারবাজি ও কর্তৃত্বের লড়াই